মহাজাগতিক রশ্মি কি ? !

রচনা : হায়ানন
অনুবাদ : রজত আচার্য্য

এক্স রশ্মি - মহাজাগতিক রশ্মির পরিবারেরই সদস্য

তুমি কি কখনও হাসপাতালেএক্স-রে পরীক্ষা করিয়েছো? 1896 সালে, এক জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী, ডাব্লু. সি. রেন্টজেন, এক্স-রে ব্যবহার করে, মানুষের হাড়ের ছবি তুলে সবাইকে অবাক করে দিয়েছিলেন | তিনি তখন সবেমাত্র নির্গমন যন্ত্র দ্বারা নির্গত এই নতুন ধরণের রশ্মি আবিষ্কার করেছিলেন এবং তাদের নাম রেখেছিলেন এক্স-রে। তাদের উচ্চ ভেদন ক্ষমতার কারণে এই রশ্মি অনায়াসে জীবদেহের মাংস পেশী, অতিক্রম করে যায় | তার ঠিক পরেই এটি জানা গেছে যে, এক্স রে-র অত্যাধিক ব্যবহার দেহের ক্ষতি করতে পারে |

একই বছর, এক ফরাসি বিজ্ঞানী, এ. এইচ. বেকারেল, দেখলেন যে একটি ইউরেনিয়াম যৌগও এক রহস্যময় রশ্মি নিঃসরণ করে | আশ্চর্যভাবে, তারা কাগজের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করতে পারে এবং একটি আলোকচিত্রের ফিল্মকে উন্মোচন করে যৌগটির ছবি তৈরি করতে পারে| ইউরেনিয়াম থেকে পাওয়া এই রশ্মিরও বৈশিষ্ট্য এক্স-রে থেকে পাওয়া এই রশ্মির মতনই কিন্তু তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে ।

জার্মানিতে সি শ্মিড্ট এবং ১৮৯৮ সালে ফ্রান্সে মেরি কুরি, থোরিয়াম থেকেও এই রশ্মির নির্গমন আবিষ্কার করলেন । এই রহস্যজনক ঘটনাটিকে "তেজস্ক্রিয়তা" নাম দেওয়া হলো | এর থেকে মেরি কুরি আবিষ্কার করলেন রেডিয়াম | এর পর থেকে তেজস্ক্রিয় গবেষণার জন্য রেডিয়াম ব্যবহৃত হতে শুরু হলো, কারণ এর তীব্র বিকিরণ ইউরেনিয়াম থেকে কয়েক হাজার গুণ বেশি শক্তিশালী |

বিজ্ঞানীরা তিন প্রকার বিকিরণ চিহ্নিত করেছিলেন: ধনাত্মক আধান যুক্ত আল্ফা কণা, ঋণাত্মক আধান যুক্ত বিটা কণা এবং আধানহীন গামা রশ্মি। ১৯০৩ সালে, মেরি কুরি, সাথে তার স্বামী পিয়ের কুরি এবং বেকারেল, পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরষ্কার পেলেন । এছাড়াও, মেরি কুরিকে ১৯১১ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছিল |

এক্স রে এবং অন্যান্য কিছু নির্দিষ্ট ধরণের বিকিরণ এখন নানান চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে, যেমন শরীরের ভিতরের পরীক্ষা ও ক্যান্সারের চিকিৎসা ইত্যাদি । যদি না শরীরের উপর বিকিরণ তীব্রতা কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তাহলে এই বিকিরণ ক্ষতিকারক হতে পারে।

রেডিয়াম নিয়ে মেরি কুরির যুগান্তকারী আবিষ্কার পরবর্তীকালে মহাকাশ থেকে আগত বিকিরণ আবিষ্কারে সাহায্য করেছিল | এই মহাজাগতিক রশ্মি, অস্ট্রিয়ান পদার্থবিদ ভি. এফ. হেস আবিষ্কার করেছিলেন | যদিও মহাজাগতিক রশ্মির উচ্চ অনুপ্রবেশ ক্ষমতা রয়েছে, তারা মানুষের শরীরের ক্ষতিসাধণ করতে পারে না কারণ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে তারা সে শক্তি হারিয়ে ফেলে | অবশ্য বায়ুমণ্ডলের বাইরে মহাজাগতিক রশ্মি নভোচারীদের জন্য ক্ষতিকারক | তাদের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নভোচারীদের রক্ষা করা প্রয়োজন হয়ে পরে |

এখন, মহাজাগতিক রশ্মি কি? এই পুস্তিকায়, তার উত্তর পেতে আপনার বন্ধু মোল এবং মিরুবোকে সহায়তা করুন।

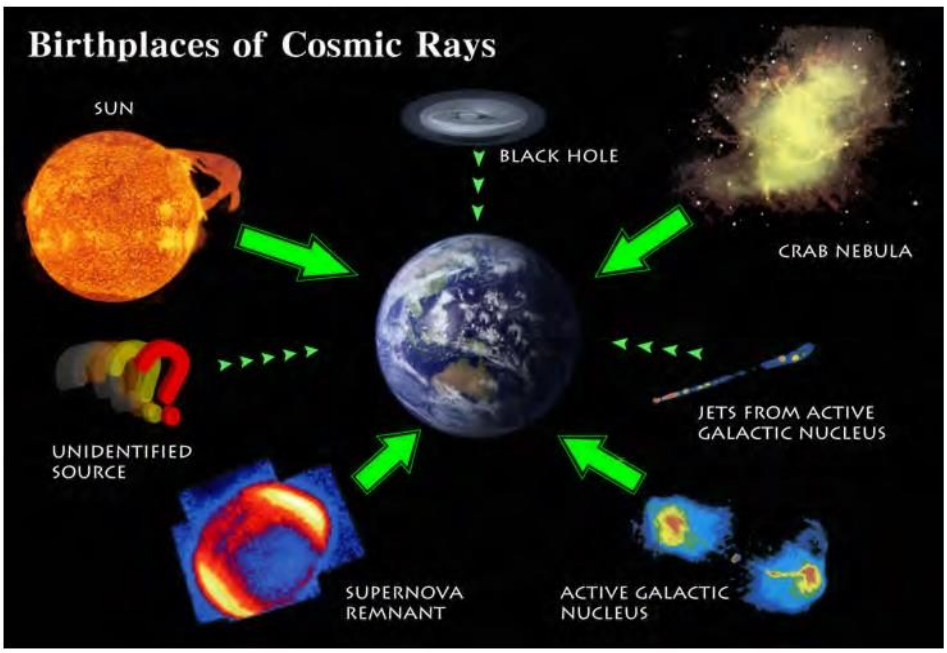

ক্ষুদ্র এবং আশ্চর্য
কণিকা মহাকাশ
পেরিয়ে পৃথিবীতে
এসে পৌঁছচ্ছে ।
এরা
মহাজাগতিক রশ্মি

আরেঃ বাহ্ !
আমি পেয়ে গেছি
রোবট কুকুর
'মিরুবো'

তুই কি দেখছিস
মিরুবো?
মহাজাগতিক
রশ্মি ।
এই বিজ্ঞান প্রেমী
মেয়েটির নাম
'মোল'

মহাজাগতিক রশ্মি? শুনে বেশ রোমাঞ্চকর লাগছে । এবার কি তাহলে আমরা মহাকাশ ভ্রমণে যাচ্ছি?
মোটেই না । আমি তো সামান্য এক শিক্ষার্থী মহাকাশযান চালক । মহাকাশ ভ্রমণ অনেক উন্নত কাজ ।
আচ্ছা । তাহলে এই মহাজাগতিক রশ্মি কি?
তুমি জিজ্ঞাসা করাতে, আমি খুশি হলাম । মহাজাগতিক রশ্মি অত্যন্ত ক্ষুদ্র কণা দিয়ে তৈরী । এই কণাগুলি এক মিলিমিটারের এক লক্ষকোটি ভাগের এক ভাগ।
এই কণাগুলি এত ছোট যে সাধারণ মানুষের চোখে এগুলি দেখাই যায় না । অবশ্য আমি আমার অসাধারণ চোখ দিয়ে এগুলি দেখতে পাই ।
ফিক ফিক
হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ
ওই, আবার ও আমায় নিয়ে মজা করতে শুরু করলো।
এটা মোটেই ঠিক হচ্ছে না, মিরুবো। আমিও মহাজাগতিক রশ্মি দেখতে চাই ।
এই এখানে এলো মহাজাগতিক রশ্মি । আর এখানেও ।
টুইং
কি বিরক্তিকর !
এবার আমি গিয়ে আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করি।

সতর্কতা : ড্রাই আইস কে খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হবে । এটি সরাসরি ভাবে স্পর্শ করবে না ।

ঘর অন্ধকার করে দাও এবং বীকারের মধ্যে তৈরি বাষ্প মেঘের উপর জোরালো আলো ফেলো। বাষ্প মেঘকে সাবধানে নিরীক্ষণ করো, তুমি দেখবে ....
500
400
300
200
100
হ ম ম
বাহ্
একটা চমক
ঝলক
আবিশ্বাস , এই চমক টা কিভাবে হলো?
ওটাই ছিল মহাজাগতিক রশ্মির কণার গতিপথ, যা আমাদের এই বীকারের মধ্যে দিয়ে গেলো ।
বাহ্, আমি মহাজাগতিক রশ্মি দেখেছি ....মানে তার গতিপথ ।
বাহ্! বাহ্!
এক স্কটিশ পদার্থবিজ্ঞানী, সি. টি. আর. উইলসন প্রথম এই মেঘ-কক্ষ করার কথা ভাবেন । ১৯২৭ সালে উনি নোবেল পুরস্কার পান। তার এই পরিকল্পনা অত্যন্ত সরল এবং সুনির্মিত ।

প্রত্যেক সেকেন্ডে প্রায় ১৪০ টি মহাজাগতিক রশ্মি কণিকা তোমার পড়ার টেবিলে পড়ছে ।
ওহ , তার মানে?
আমি তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ।
মহাজাগতিক রশ্মির পুরো ব্যাপারটা কি?

দুই ধরণের মহাজাগতিক রশ্মি আছে, সূর্য থেকে আসা মহাজাগতিক রশ্মি এবং নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে আসা মহাজাগতিক রশ্মি।
সূর্য থেকে আসা মহাজাগতিক রশ্মি, তাদের সৃষ্টির কয়েক ঘন্টার মধ্যেই পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় ।
অন্য দিকে, নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে আসা মহাজাগতিক রশ্মি সুপারনোভা অঞ্চলে সৃষ্টি হয়...
এবং তাদের সৃষ্টির এক কোটি বছরেরও বেশি সময় ভ্রমণের পর তারা পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় ।

প্রায় আলোক গতিতে তারা পৃথিবীতে এসে আঘাত করে ।

আমি জানি,
আমরা যদি এই
পরীক্ষা ঘরের বাইরে করি,
তাহলে আমরা মহাজাগতিক
রশ্মির আরো বেশি কণা
দেখতে পাবো, তাই না?
না, এই রশ্মি কণিকা অনায়াসে ঘরের মধ্যে
ঢুকে পড়তে পারে, তাই বাইরে গেলে বেশি
তারতম্য হবে না। এরা অনায়াসে, মাটি, সিমেন্ট
এমনকি আমাদের শরীরের
মধ্যে দিয়েও চলে যেতে
পারে ।
আরেঃ, তাই নাকি?!
আমি তো খেয়াল করি নি
তোমার
জানা উচিত
ছিল ।
আমার মনে আছে,
মহাজাগতিক রশ্মি
একপ্রকার বিকিরণ
সত্যি?
চিন্তা করার কিছ্ছু নেই।
যতোক্ষন আমরা পৃথিবীতে
আছি, এরা আমাদের
কোনো ক্ষতি করতে
পারবে না ।
ওফফ, বাঁচা
গেলো ।
তুই আমাকে
ভয় পাওয়াস
না

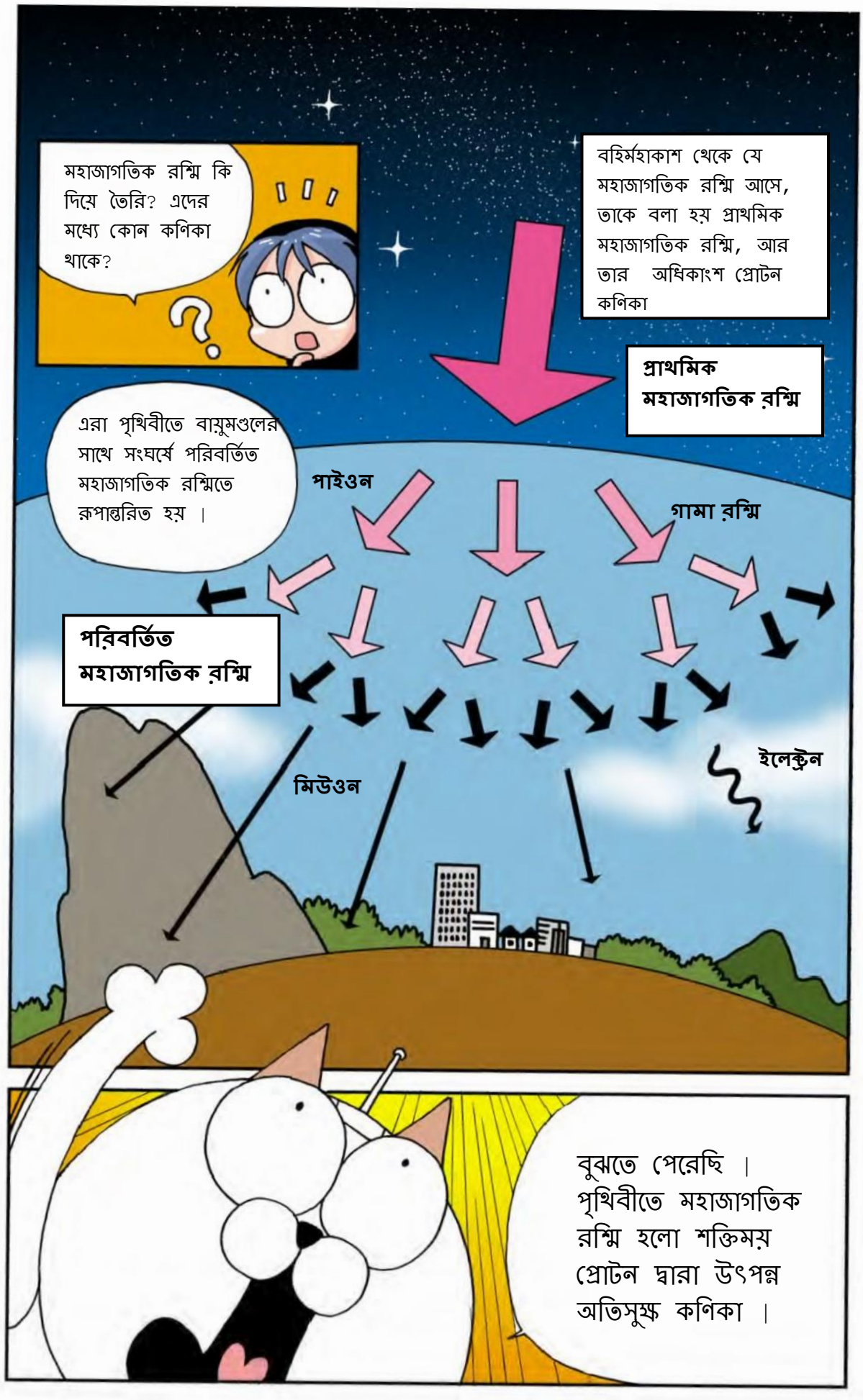
মহাজাগতিক রশ্মি কি দিয়ে তৈরি? এদের মধ্যে কোন কণিকা থাকে?
বহির্মহাকাশ থেকে যে মহাজাগতিক রশ্মি আসে, তাকে বলা হয় প্রাথমিক মহাজাগতিক রশ্মি, আর তার অধিকাংশ প্রোটন কণিকা
প্রাথমিক মহাজাগতিক রশ্মি
এরা পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডলের সাথে সংঘর্ষে পরিবর্তিত মহাজাগতিক রশ্মিতে রূপান্তরিত হয় ।
পাইওন
গামা রশ্মি
পরিবর্তিত মহাজাগতিক রশ্মি
ইলেক্ট্রন
মিউওন
বুঝতে পেরেছি । পৃথিবীতে মহাজাগতিক রশ্মি হলো শক্তিময় প্রোটন দ্বারা উৎপন্ন অতিসুক্ষ্ম কণিকা ।

একদম ঠিক। এগুলি সুক্ষ্ম কিন্তু অতিশয় শক্তিশালী ।
অতিশয় শক্তিশালী মানে ঠিক কতটা?
একটা সাধারণ উদাহরণ নেওয়া যাক, তোমাদের বাড়িতে আর ইস্কুলে যে ফ্লুরোসেন্ট বাতি দেখো তার শক্তির সঙ্গে মহাজাগতিক রশ্মির তুলনা করা যাক ।
ফ্লুওরোসেন্ট বাতির মধ্যে, একটি পরমাণু উত্তেজিত অবস্থা থেকে তার সাধারণ অবস্থায় প্রত্যাবর্তন কালে, তার অতিরিক্ত শক্তি আলোকের আকারে নির্গত হয়।
এই শক্তির মান ২ ইলেক্ট্রন ভোল্ট ।
আর মহাজাগতিক রশ্মির কণার শক্তি হয়....
১০০ কোটি ইলেক্ট্রন ভোল্ট ।
ইইইইইই , আমাদের যদি এই কণা আঘাত করে....
তাহলে আমরা প্রচণ্ড ভাবে তড়িতাহত হবো।
দাড়াও, আমি কখনো এমন আপুদে কণার কথা শুনিনি ।
কেন কেউ এদের বিষয়ে সতর্ক হয় না?

মহাজাগতিক রশ্মি অবশ্যই উচ্চ শক্তিশালী ।
কিন্তু তাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম ।
পৃথিবীর আয়তনের হিসাবে, যতগুলি মহাজাগতিক রশ্মি কণিকা পৃথিবীতে পৌঁছচ্ছে , তার সংখ্যা এত কম যে তারা আমাদের প্রভাবিত করে না ।

এটা ঠিক যেন এমন ভাবা যে, বর্ষার এক বিন্দু জলে আমাদের পানীয় জলের সব ঘাটতি পূরণ হয়ে যাবে।
ওহ! বুঝলুম, এ তো সত্যি ভীষণই নগন্য ।

মহাজাগতিক রশ্মি পৃথিবীতে কার্যতভাবে শক্তিহীন । আমি ভেবেছিলাম যে ওই শক্তি দিয়ে ওরা কিছু করতে পারবে ।
তুমি ঠিক বলেছো, মোল।

এরা এতো দূর থেকে এখানে আসে, কিন্তু কোনো কাজে আসে না ?
ওদেরকে উপেক্ষা করলেই হয়। এরা তো পৃথিবীতে অনাহুত অতিথি ।
এটা কোনো রাসিকতা নয়

এতো তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলো না । এরা অনেক ভাবেই আমাদের উপকারে লাগে ।
সেকি ?
কিভাবে?
মহাজাগতিক রশ্মির মিউওন পাথরের মধ্য প্রায় ১ কিলোমিটার প্রবেশ করতে পারে ।
তাদের এই বৈশিষ্টের সাহায্য নিয়ে আমরা ইজিপ্টের পিরামিডের ভিতরের আকার সম্বন্ধে গবেষণা করতে পারি.....
?
আর জানতে পারি আগ্নেয়গিরির ভিতরে ম্যাগমার অবস্থা সম্পর্কে।
মহাজাগতিক রশ্মির ব্যবহারে আমরা চাঁদ আর মঙ্গলের পৃষ্ঠতলের নিচে জলের অনুসন্ধানের জন্য অধ্যয়ন করতে পারি ।
কি বিস্ময়কর !! আমি কখনো এমন কথা চিন্তা করিনি ।

আমি আশাবাদী যে এই মহাজাগতিক রশ্মি ভবিষ্যতে আরো অনেক কাজে ব্যবহার হবে .....
আর তার সঙ্গে মহাজাগতিক রশ্মি বিষয়ে গবেষণার আরো অগ্রগতি হবে ।
শুনে মনে হচ্ছে বহির্মহাকাশ থেকে পাঠানো কোনো সংকেতবার্তা আমরা পাঠোদ্ধার করতে পারবো ।
মহাকাশ থেকে পাঠানো বার্তা..... সে তো দারুন রোমাঞ্চকর ।
আমি নিশ্চই মহাজাগতিক রশ্মি ধরতে পারবো ..... তুমি তো ব্রহ্মান্ডের বার্তাবহ ।
আহা মোল , তুমি যদি সত্যিই তা করতে পারতে । তারা তো তোমার শরীরের মধ্যে দিয়েই প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে ।

মহাজাগতিক রশ্মি কি?

- আমি মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে জানতে বিশেষ আগ্রহী| প্রথমত, মহাজাগতিক রশ্মি কত উচ্চশক্তির হতে পারে?

- মহাজাগতিক রশ্মির শক্তি, অন্যান্য প্রাকৃতিক বিকিরণের থেকে ১০০০ গুন্ বেশি | অতি উচ্চশক্তির মহাজাগতিক রশ্মির ক্ষেত্রে কখনো কখনো এর শক্তি ১০ লক্ষ কোটি গুন্ হতে পারে |

- বাপ রে, কোথা থেকে এরা এতো উচ্চ শক্তি পায়?

- খুব ভালো প্রশ্ন, মোল | মহাজাগতিক রশ্মি, অন্যান্য কণার সঙ্গে ধারাবাহিক সংঘর্ষে এই শক্তি আহরণ করে|

- এরা আসে কোথা থেকে?

- এদের সৃষ্টি হয় সূর্যে, দূরের কোনো তারায় বা সুদূর কোনো নক্ষত্রপুঞ্জে | আবার, সৌর প্রজ্জ্বলন বা তারকা বিস্ফোরণ থেকেও এদের সৃষ্টি হয় |

- এদের কি দেখা যায়? এদের রং, আকার বা গন্ধ ই বা কেমন?

- আমি তো এদের দেখতে পাই | কিন্তু রং বা গন্ধটা ঠিক জানা নেই | অন্তত এদের কোনো

সুস্বাদু খাবারের মতো গন্ধ তো এদের মোটেই নেই |

- মহাজাগতিক রশ্মি অত্যন্ত ক্ষুদ্র কণিকা | অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও এদের দেখা যায় না | কোনো রং বা গন্ধও এদের নেই | মেঘ কক্ষ বা ক্লাউড চেম্বার নামক যন্ত্রের সাহায্যে মহাজাগতিক রশ্মি দৃশ্যমান করা যেতে পারে | এরা মহাকাশ থেকে প্রায় আলোকের গতির সমান বেগে পৃথিবীতে এসে পড়ছে |

- এরা কি চাঁদ আর মঙ্গল গ্রহতেও এসে পড়ছে?

- নিশ্চই | মঙ্গলের একটি ক্ষীণ বায়ুমণ্ডল আছে | আর সেই কারণে মনে করা হয়, চাঁদের তুলনায় মঙ্গলে প্রায় অর্ধেক মহাজাগতিক রশ্মির কণা পৌঁছয় | মহাকাশে ভ্রমণরত মানুষদের জন্য মহাজাগতিক রশ্মি ক্ষতিকর হতে পারে | কিন্তু আমার মনে হয়, তোমার জন্যে তা নয়, তাই না মিরুবো?

- হুঁ হুঁ বাবা, আমি তো এইভাবেই তৈরী|

- তুই ভাগ্যবান, মিরুবো | কিভাবে, মহাজাগতিক রশ্মির সাহায্যে মঙ্গলে ও চাঁদে জল খোঁজা হচ্ছে, তা আমাদের একটু বলবেন, মশায়?

- মহাজাগতিক রশ্মি মঙ্গল ও চাঁদের পৃষ্ঠে প্রায় ৪০ সেনটিমিটার পর্যন্ত প্রবেশ করে পৌঁছে যেতে পারে পৃষ্ঠতলের নীচে থাকা বরফের কাছে | এই কণাগুলি হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস দ্বারা প্রতিফলিত হয়, ঠিক বিলিয়ার্ড বলের মতন | আর আমাদের তখন কৃত্তিম উপগ্রহের মাধ্যমে এই প্রতিফলিত কণাগুলি মাপলেই হবে | যেখানে হাইড্রোজেন দ্বারা প্রতিফলিত কণাগুলির সংখ্যা বেশি, আমরা তাকেই, জল থাকার সম্ভাবনাময় জায়গা হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি|

- কিন্তু অক্সিজেন? জল (H_2O) তো হাইড্রোজেন (H_2) আর অক্সিজেন (O_2)এর যৌগ | কিভাবে বোঝা যাবে যে সেখানে অক্সিজেন ও আছে?

- ভালো প্রশ্ন | জলের উপস্থিতি প্রমান করার জন্য, যেখানে প্রতিফলিত মহাজাগতিক রশ্মির মান বেশি, যেমন চাঁদের মেরুঅঞ্চলে, আমাদের খোদাই করতে হবে |

- সূর্যের মতো, পৃথিবীও কি মহাজাগতিক রশ্মি নিঃসরণ করে? যদি আমি চাঁদে যাই, তাহলে কি এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে?

- পৃথিবীর প্রস্তরভাগ থেকে বিকীর্ণ মহাজাগতিক রশ্মির শক্তি এতোই কম যে তা বায়ুমণ্ডলেই শোষিত হয়ে যায় | অন্যদিকে, মেরুপ্রভা থেকে নিঃসৃত নিম্ন শক্তির গামা এবং এক্স রশ্মি চাঁদ থেকে মাপা সম্ভব কারণ এদের নিঃসরণ হয় উপরি বায়ুমণ্ডলের ক্ষীণ অংশে | এদের শক্তি এতোই কম যে এদেরকে মহাজাগতিক রশ্মি বলা যায় না | বরং এদের "পার্থিব রশ্মি" বলা যেতে পারে |

- "পার্থিব রশ্মি"?! দারুন তো !!

- আমি চেষ্টা করবো আমার কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে চাঁদ পর্যন্ত যেতে, যাতে আমি আমার নিজের

চোখে "পার্থিব রশ্মি" দেখতে পাই |

যত উপরে যাই , তত বেশি শিখতে পাই

সাধারণত পাহাড়ের উপর মহাজাগতিক রশ্মির পরিমাপ করা হয় | কেন জানো তো ? কারণ পৃথিবী বায়ুমণ্ডল দ্বারা আবৃত |

এক ফরাসি বিজ্ঞানী বি. পাস্কাল বায়ুমণ্ডলের চাপ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেন | বায়ুমণ্ডলের চাপের একক, হেক্টোপাস্কাল, ওনার নাম অনুসারেই হয়েছে | ১ হেক্টোপাস্কাল সমান ১০০ পাস্কাল | তোমরা হয়তো টেলিভিশনে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলতে শুনেছ যে ঘূর্ণিঝড়ের বায়ুমণ্ডলীয় চাপ ৯১০ হেক্টোপাস্কাল | তার মানে এটা একটা শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় | এই ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপের থেকে ১০% কম থাকে |

পাহাড়ের চূড়ায়, বায়ুমণ্ডলীয় চাপ, এর থেকেও কম হয় | উদাহরণ স্বরূপ, সমুদ্রতলের ২৭৭০ মিটার উপরে মাউন্ট নরিকুড়ার চূড়ায় আমাদের যে সৌর-নিউট্রন দূরবীক্ষণ যন্ত্র আছে, সেখানে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ সমুদ্র তলের চাপের থেকে ২৫% কম | মাউন্ট ফুজির চূড়ায় এই চাপ ৬০% কম |

বলিভিয়ার চাকলতায়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র সমুদ্রতলের ৫২৫০ মিটার উপরে অবস্থিত | সেখানকার বায়ুর ঘনত্ব সমুদ্রতলের থেকে অর্ধেক | তোমরা যদি কখনো অভিযাত্রীদের মাউন্ট এভারেস্ট-এ চড়ার ভিডিও দেখে থাকো, তাহলে তোমরা সহজেই বুঝতে পারবে এতো ক্ষীণ বাতাসে মানুষের থাকা কত কষ্টকর |

কিন্তু, এই ক্ষীণ বাতাস মহাজাগতিক রশ্মি পর্যবেক্ষনের জন্য সুবিধাজনক, কারণ অন্যথায় তা বায়ুমণ্ডলে শোষিত হয়ে যায় | বায়ুমণ্ডলীয় ভারের ২০০ গ্রাম/ঘনসেনটিমিটার পরিবর্তন, মহাজাগতিক রশ্মির বিকিরণে ১০ গুন্ পরিবর্তন করতে পারে | অর্থাৎ, একই যন্ত্র দ্বারা মাউন্ট চাকলতায়ার তুলনায় মাউন্ট নরিকুড়ার পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের মহাজাগতিক রশ্মির সংখ্যা ১০ গুন্ কম হতে পারে | সেই সঙ্গে একই যন্ত্র ব্যবহার করলে, মাউন্ট চাকলতায়ার গণনায় সঠিকতা অনেক বেশি হবে |

এবার বুঝলে, কেন যত উচ্চতায় যাই, তত বেশি মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে শিখতে পাই?

মাউন্ট নরিকুড়ার চূড়ায় সৌর-নিউট্রন দূরবীক্ষণ যন্ত্র

চাকলতায়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র

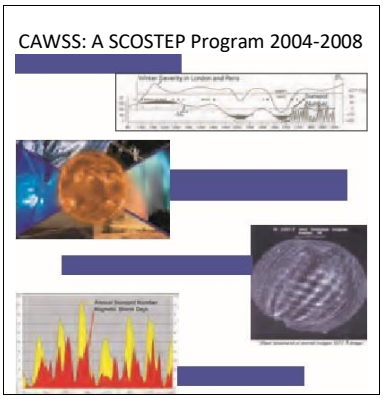

সূর্য ও পৃথিবীর সম্মিলিত তন্ত্রের আবহাওয়া ও জলবায়ু (CAWSES)

CAWSES হলো SCOSTEP প্রযোজিত একটি আন্তর্জাতিক কার্যক্রম। মহাকাশ ও তার পরিবেশ এবং আমাদের জীবন ও সমাজে তার প্রভাবের ব্যাপারে আমাদের বোধ উল্লেখযোগ্য ভাবে উন্নত করার লক্ষ্যে এটি স্থাপিত হয়। CAWSES এর প্রধান কার্যাবলী হলো, এই বোধ অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষন, মডেল তৈরি ও তত্ব গঠনে আন্তর্জাতিক কার্যাবলী সম্পাদনে সাহায্য করা। সেই সঙ্গে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির বৈজ্ঞানিকদের এই কাজে বিজড়িত করা ও সকল স্তরের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুযোগ প্রদান করা। CAWSES এর কার্যালয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বস্টন, ম্যাসাচুসেটস-এ অবস্থিত বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে। CAWSES এর বিজ্ঞান বিষয়ক চারটি মূল প্রসঙ্গ ছবিতে দেখানো আছে।

http://www.bu.edu/cawses/
http://www.ngdc.noaa.gov/stp/SCOSTEP/scostep.html

সোলার টেরেস্ট্রিয়াল এনভায়রনমেন্ট ল্যাবরেটরি (STEL) নাগোয়া বিশ্ববিদ্যালয়

জাপানে STEL পরিচালিত হয় আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় সমবায় পদ্ধতি দ্বারা। এর উদ্দেশ্য, জাপানে এবং অন্যান্য দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায়, সৌর-ভৌম তন্ত্রের গঠন ও পরিবর্তনের উপর গবেষণাকে আরো উন্নীত করা । এই গবেষণাগার চারটি বিভাগে ভাগ করা: বায়ুমণ্ডলীয় পরিবেশ, আয়োনোস্ফেরিক ও চৌম্বকীয় পরিবেশ, হেলিওস্ফেরিক পরিবেশ এবং সমন্বিত পঠন বিভাগ । জিওস্পেস রিসার্চ সেন্টারও, যৌথ গবেষণা প্রকল্পগুলি সমন্বয় ও উন্নীত করার উদ্দেশ্যে, এই গবেষণাগারের সঙ্গে সংসৃষ্ট । দেশব্যাপী বিন্যস্ত এর সাতটি মানমন্দির ও পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে, বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক সত্বার, ভুস্থলভিত্তিক পর্যবেক্ষণ করা হয় ।

http://www.stelab.nagoya-u.ac.jp/

はやのん

হায়ানন : রিওক্যু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতক হায়ানন একযোগে এক লেখক ও কার্টুনিস্ট । বিজ্ঞান ও কম্পিউটার-গেমস এ তার গভীর ব্যুৎপত্তির ভিত্তিতে তিনি বিভিন্ন জনপ্রিয় পত্রিকায় প্রচুর ধারাবাহিক-এ তার অবদান রেখেছেন । তার সামঞ্জস্যপূর্ণ লিখনি শৈলীতে প্রত্যক্ষিত তার বিজ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা আজ সর্বজনবিদিত ।

http://www.hayanon.jp/

子供の科学

কোডোমো নো কাগাকু (ছোটদের জন্য বিজ্ঞান) : সেইবুন্দ শিনকশা প্রকাশনা সংস্থা দ্বারা প্রকাশিত, কোডোমো নো কাগাকু, ছোটদের জন্য প্রকাশিত একটি মাসিক পত্রিকা । ১৯২৪ সালে প্রকাশিত এর প্রথম সংস্করণের থেকেই এই পত্রিকাটি বিজ্ঞান শিক্ষার পরিষেবায় নিয়োজিত । এই পত্রিকায়, দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানভিত্তিক ঘটনা থেকে শুরু করে সাম্প্রতিকতম গবেষণা বিষয়, ইত্যাদি বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয় ।

http://www.seibundo.net/